চৈত্র সংক্রান্তি

- অজয় রায়[১]

বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী বর্ষান্তের চৈত্র মাসের শেষ দিনকে অভিহিত করা হয় চৈত্র সংক্রান্তি নামে। সাধারনভাবে শেষ দিনটি হয়ে থাকে ৩০শে চৈত্র। বাংলা একাডেমী সংস্কারায়িত বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বছরের প্রথম পাঁচ মাস (বৈশাখ - ভাদ্র) গণনা করা হয় ৩১ দিনে, বাকী ৭ মাস ৩০ দিনে। সে হিসেবে ৩০শে চৈত্রকে ধরা হবে চৈত্র সংক্রান্তি। অন্যদিকে ভারতীয় বাংলা পঞ্জিকাকারগণের পুরানো হিসেব মতে দিনটির তারতম্য হতে পারে, আবার মিলেও যেতে পারে। যেমন ১৪১৪ সালের লোকনাথ ডাইরেক্টরী মতে চৈত্র মাস ত্রিশ দিনের বাংলা একাডেমীর সাথে একই দিনে পড়েছে (১৩ই এপ্রিল ২০০৮ রবিবার)। এবার অর্থাৎ ১৪১৬ সালের ৩০শে চৈত্র পড়েছে ১৩ই এপ্রিলে তবে বারটি হচ্ছে মঙ্গল। আমাদের সংস্কারায়িত বর্ষপঞ্জির বিশেষত্ব হচ্ছে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলির সাথে গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের সাথে প্রাতিষঙ্গিকতা বজায় থাকে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অনেক বাংলা ক্যালেন্ডারের সাথে আমাদের দিনের কোন কোন সময় ব্যতয় ঘটে। তবে সংস্কারায়িত শকাব্দের সাথে খুব একটা বিরোধ ঘটে না, কারণ এটি সংস্কারায়িত হয়েছে ড. মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক সুপারিশ ক্রমে যা বাংলা একাডেমীও গ্রহণ করেছিল আমাদের বর্ষপঞ্জি সংস্কার কালে। আমাদের সাথে পশ্চিম বঙ্গীয় বাংলা পঞ্জিকার বড় অনৈক্য ঘটেছে ১লা বৈশাখের প্রাতিষঙ্গিকতাকে কেন্দ্র করে – ওরা ১লা বৈশাখ করে অধিকাংশ সময় ১৫ই এপ্রিলে, আর আমরা করে থাকি ১৪ই এপ্রিলে প্রতি বছর। বৃহত্তর স্বার্থে এটুকু অসামঞ্জস্য আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। তারতম্যের আরও কয়েকটি নমুনা দিই ঃ

পশ্চিম বঙ্গে পালিত চৈত্র সংক্রান্তি	ইংরেজী তারিখ	আমাদের পালিত চৈত্র সংক্রান্তি	ইংরেজী তারিখ	এন্তব্য
১৪০৮ঃ ৩১ শে চৈত্র, লোকনাথ	১৪ই এপ্রিল, ২০০২ (রবি)	৩০শে চৈত্র (শনি)	১৩ইএপ্রিল, ২০০২	তারতম্যের কারণ স্বতঃস্পষ্ট
১৪১১: ৩১শে চৈত্র (বৃহস্পতি), গুপ্তপ্রেষ	১৪ই এপ্রিল, ২০০৫	৩০শে চৈত্র (বুধবার)	“	
১৪১২: ৩১শে চৈত্র (শুক্র), লোকনাথ	১৪ই এপ্রিল, ২০০৬	৩০শে চৈত্র (বৃহস্পতি)	”	
১৪১৩: ৩০শে চৈত্র (শনি),মদনগুপ্ত	১৪ই এপ্রিল, ২০০৭	৩০শে চৈত্র (শুক্র)	”	লক্ষ্যণীয় বাংলা ৩০শে চৈত্র তারিখে চৈত্র সংক্রান্তি পড়লেও ইংরাজী তারিখের প্রাতিষঙ্গিকতা পালিত হয় নি। কারণ পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ক্যালেন্ডারে ৩০শে চৈত্র পড়লেও অন্যমাসের দিনগুলিতে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি।
১৪১৪: ৩০শে চৈত্র (রবি), বেণীমাধব	১৩ই এপ্রিল, ২০০৮	৩০শে চৈত্র (রবি)	১৩ই এপ্রিল, ২০০৮	এ বছর উভয় বঙ্গে একই দিনে চৈত্র সংক্রান্তি পড়েছে

[১] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও কলাম লেখক

হিন্দুরা এ দিনটিকে অত্যন্ত একটি পুন্যদিন বলে মনে করে। এছাড়া সাধারনত এই বসন্তকালে বাসন্তী দেবী ও অন্নপূর্ণাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হিন্দু পঞ্জিকা মতে দিনটিকে গণ্য করা হয় মহবিষুব সংক্রান্তি নামে। হিন্দুরা পিতৃপরুষের তর্পন করে থাকে, নদীতে বা দিঘীতে পুন্যস্নান করে থাকে।

ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের পরিবারে মহা ধুমধামের সাথে চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হত। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে পিতৃদেব নদীতে পুন্য স্নান সেরে সূর্য উপাসনা করতেন, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পন করতেন অনেক্ষণ ধরে। অনেক হিন্দুকে দেখেছি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডিদান করতেও। মা সকাল থেকেই স্নান সেরে সুন্দর শাড়ী পড়ে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। সংক্রান্তির আগের দিন রাতভর নানা মিষ্টি, বিশেষ ধরনের পিঠা, খৈ, মুড়ি আর চিড়ের লাড়ু তৈরী করতেন। সকালে চমৎকার শাড়ী পড়া মাকে অপূর্ব সুন্দরী মনে হত। আমরা মার আশে পাশে ঘুরঘুর করতাম মিষ্টি আর মিষ্টান্নের লোভে। প্রসন্নময়ী মা আমাদের নিরাশ করতেন না। বিতরণ করতেন দরাজ হাতে। আমার দাদা বলে উঠতেন 'মা প্রতিদিন তুমি এত সুন্দর হতে পার না, হতে পার না দয়াময়ী।' মা কৃত্রিম রাগে দাদাকে বকতেন, আর পরক্ষণেই চুমুতে ভরে দিত দাদার মুখ। আমরাও বঞ্চিত হতাম না মায়ের সুখস্পর্শ থেকে। বাবার পিতৃব্য সংক্রান্তির সকালে স্নান সেরে মাকে প্রথমেই কাছে ডেকে এনে মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে কী সব মন্ত্র আউড়িয়ে মাকে আশীর্বাদ করতেন। প্রতি বছরই এই ছবির পুনরাবৃত্তি ঘটত। মা তাঁকে ভক্তি ভরে প্রণাম সারলে ঠাকুর্দা বলতেন 'মা তোমাকে আজ দেবী অন্নপূর্ণার মত সুন্দরী লাগছে। তারপর চিবুক ছুয়ে বলতেন, 'চিরআয়ুস্মতী ভব'। গৌড়বর্ণা মা লাজে আরও রক্তিম হতেন। মাই ছিলেন আমাদের কাছে সকল আনন্দের, সকল সুখের কেন্দ্র বিন্দূ। বাবা অনেকটাই দূরের মানুষ ছিলেন, স্নেহ পরায়ন হলেও।

মা সেদিন অনেক ধরনের ব্যঞ্জনাদির সাথে অনেক পদের শাক রান্না করতেন। অনেকগুলি শাকই থাকত ওষুধি গুণযুক্ত। মা এসব কোত্থেকে শিখেছিলেন জানি না, অথচ তাঁর শ্বাশুড়ী, মা এই পরিবারে পুত্রবধু হয়ে আসার ২-৩ বছরের মধ্যে মারা যান, প্রশিক্ষণ পাওয়ার খুব সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে

হয় না। মার মুখেই শুনেছি, মা যখন এ সংসারে এলেন তখন ছিলেন অষ্টাদশী। মা একদিন গল্পচ্ছলে আমাদের ভাইবোনদের বলেছিলেন, 'জানিস, আমি যখন এ সংসারে এলাম কালাজ্বর থেকে সদ্য সেরে ওঠা, আমার গাত্রবর্ণ দেখে শ্বাশুরী-ননদদের মুখ আমার আপাত কালো বর্ণের চেয়েও কালো হয়ে উঠেছিল।' এই বলে মা হাসিতে লুটিয়ে পড়তেন। তারপর প্রসাধন চর্চায় কালাজ্বরের প্রভাবে 'কালাভাব' ২-১ মাসের মধ্যে সরে গিয়ে মা তাঁর আদি গৌড়বর্ষ ফিরে পেলে, তখন পরিবারের মেয়ে সদস্যদের হাসি দেখে কে, এই বলে মা আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়তেন। আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতাম।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে আমাদের বাসায় একটি রীতি ছিল সেদিন সকালে আমরা সবাই প্রাতঃরাশ শুরু করতাম নানা ধরনের ছাতু খেয়ে। ছাতুর গোল্লা তৈরী হত গুড়, দৈ বা দুধের মিশ্রণে, অনেক সময় কলাও মেশানো হতো। দাদা ও আমার ঠাকুরদার চাহিদা ছিল এর সাথে অতি অবশ্য গুড়ের সন্দেশ। আমরা তৃপ্তির সাথে খেতাম। ছাতুর প্রকার ছিল – বুট, পয়রা বা যব, মাকই বা ভুট্টা । মা এতো সব কখন বানাতেন আমরা বুঝতে পারতাম না। মার অবশ্য একজন সার্বক্ষণিক বালবিধবা সহায়িকা ছিলেন, যাকে আমরা ডাকতাম 'তনু দি', আর এক জন পরুষ সহায়ক ছিলেন- মার সাথে পিত্রালয় থেকে আসা নেপালী সহচর 'বুনিয়াদ সিং'। আমরা সিং কাকু ডাকতাম। তার কাছে আমাদের সবচাইতে আকর্ষণীয় একটি দ্রব্য ছিল তীক্ষ্ণধার 'ভোজালী'।

এ দিন আর একটি রীতি পালন করা হতো বেশ নিষ্ঠার সাথে। তাহলো, নান প্রকারের ওষুধি গাছের পাতা ও শিকড় একত্রে বেধে সুতো দিয়ে প্রতিটি ঘরের দরজার মাথায় ঝুলিয়ে দেয়া হতো এক বছরের জন্য। এ সব সংগ্রহে মাকে সহায়তা করতো সিং কাকু, নানা বনজঙ্গল ঘেটে তিনি সংগ্রহ করতেন। অবশ্য বাবারও এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল। আমরাও প্রবল উৎসাহে গাছ গাছালি সংগ্রহে লেগে যেতাম। এক ধরনের ছোট গাছের কথা আমার এখনও মনে আছে – তাকে আমাদের অঞ্চলে বলা হতো 'বিষ কুট্টলি'। তা ছাড়া থাকত নিমের পাতা, হলুদ গাছের চাড়া, রসুনের গাছু বা পাতা। যত্নের সাথে ঝোলানোর পর, মা দরজার ওপরের আনুভূমিক কাঠটির মাঝখানে, পাঁচটি করে সিন্দুর আর চন্দনের ফোটা লাগিয়ে দিতেন সুন্দর করে। তাছাড়া বাড়ির মেঝেতে আঁকা হতো জল মিশ্রিত চালের গুড়ো দিয়ে শ্বেত শুভ্র 'আলপনা'। সেদিন দুপুরে নানা পদের নিরামিষ দিয়ে আমাদের চমৎকার দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাপ্ত হতো। কিছু অতিথি সব সময় থাকতেন। এ সবের পেছনেই থাকতো মার ভূমিকা। মাকে কেন জানি আমার মনে হতো দশভুজা দুর্গা। সবদিক থেকেই আমাদের পরিবারটিকে মনে হতো যেন একাই রক্ষা করে চলেছেন। মা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, শয্যাপার্শে আমি ছাড়া কেউ ছিলেন না, পিতৃদেব কয়েক বছর আগেই চলে গেছেন, - যখন বললাম 'মা আমাদের কে দেখবে ?' বাকরুদ্ধ মা কেবল মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সেই জগজ্জননী মাকে আমার বারবার মনে পড়ে চৈত্র সংক্রান্তি এলে। পরিবর্তিত পরিবেশে, নাগরিকতার চাপে আমরা আর কেউ সেদিনের মত চৈত্রের শেষ দিনে মহাবিষুব সংক্রান্তি উৎসব পালন করতে পারি না।

চৈত্রের শেষ দিনে আমাদের আর একটি আকর্ষনীয় দর্শনী ছিল একটি খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত চড়ক পূজো। একটি সুউচ্চ বাশের পোলের উপরে স্থাপিত একটি আর আনুভূমিক বাশের লিভারের এক প্রান্তে একটি জলজ্যান্ত মানুষের পিঠে বড়শির হুক দিয়ে আটকিয়ে তাকে ঝুলিয়ে দেয়া হত– আনুভূমিক বাশটির অন্য প্রান্তটি দিয়ে ঝুলন্ত মানুষটিকে বন বন করে ঘোরানো হত। আমরা বিস্ফারিত লোচনে অবাক হয়ে দেখতাম আর ভয়ে শিহরিত হতাম। সে এক ভয়ানক রোমঞ্চকর অনুভূতি।

চৈত্র সংক্রান্তির একটি জ্যোতির্বৈদ্যিক দিক আছে। সেটির সামান্য প্রসঙ্গ টেনে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানব। সংক্রান্তিকথাটির অর্থ হল অতিক্রম করা বা অতিক্রমণ। বিশেষ অর্থ হল সুর্য যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করে তাকেই বলা হয় সংক্রান্তি। চলতি কথায় মাসের শেষ দিবসকেই বলা হয় সঙক্রান্তি - পৌষ মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় 'পৌষ সংক্রান্তি', আর চৈত্রের শেষ দিবস অভিহিত হয় চৈত্র সংক্রান্তি নামে। চৈত্রের শেষ দিবসকে পঞ্জিকাকাররা বলে থাকেন 'মহাবিষুব' সংক্রান্তি , আর আশ্বিনের শেষ দিন হল 'জলবিষুব' সংক্রান্তি।

মহাকাশে (Celestial sphere) পৃথিবীর অক্ষ রেখার ওপর লম্বভাবে অঙ্কিত মহাবৃত্তের নাম বিষুব বৃত্ত (Equator) । আর মহাকাশে পৃথিবীর চার পাশে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতিপথকে বলা হয় 'রবি মার্গ' বা রাশি চক্র (Ecliptic)। এই দুটি মহাবৃত্ত একই সমতলে অবস্থান করে না – তারা পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে এবং উভয়ের মধ্যে ২৩°২৭' কোন রচিত হয়। এই ছেদ বিন্দু দুটির নাম যথাক্রমে মহা বিষুব বিন্দু (vernal equinox or first point of Aries, γ) এবং জলবিষুব বিন্দূ (autumnal equinox or first point of Libra, Ω)। পৃথিবীর মেরুঅক্ষ ক্রান্তি তলের অক্ষের সাথে ২৩°২৭' হেলে থাকে বলেই বিষুব বৃত্ত ও ক্রান্তি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে, আর এ কারণেই পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন হয়। সাধারনভাবে ২১শে মার্চ তারিখে সুর্য ক্রান্তি বৃত্ত ও বিষুব বৃত্তের মধ্যে ছেদ বিন্দু γ'কে অতিক্রম কওে যায, আর তাই ২২শে মার্চ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়, কারণ এ সময় সূর্য বিষুব বৃত্তে অবস্থান করে। এর পর থেকেই উত্তর গোলার্দ্ধে দিন বাড়তে থাকে আর রাত ছোট হতে থাকে, এবং ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্দ্ধে আমরা পাই দীর্ঘতম দিন আর হ্রস্বতম রজনী । সূর্য এ সময় কর্কট ক্রান্তি বৃত্তে অবস্থান করে। ক্রান্তি বৃত্তে সূর্যের এই প্রান্তিক অবস্থান বিন্দুকে বলা হয় উত্তর অয়নান্ত (summer solstice)। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবশ্য এর বিপরীত। এর পর থেকে দিন ছোট হতে থাকে আর রাত বড় হতে থাকে, অবশেষে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য পুনরায় অবস্থান নেয় বিষুব বৃত্তের Ω বিন্দুতে যেখানে ক্রান্তি বৃত্ত ও বিষুব বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করেছে। একে বলা হয় 'জলবিষুব বিন্দু' (autumnal equinox)। এই দিন পুনরায় পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত সমান হয়ে থাকে। অতঃপর উত্তর গোলার্দ্ধে ক্রমশঃ রাত বড় হতে হতে সূর্য পৌঁছে যায় ক্রান্তি বৃত্তের দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দুতে (winter solstice) ২২শে ডিসেম্বর তারিখে যখন উত্তর গোলার্ধে হয় দীর্ঘতম রজনী আর ক্ষুদ্রতম দিবস। এ সময় সূর্য মকর বৃত্তে অবস্থান করে থাকে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ২১শে জুনের পর থেকে সূর্য রাশি চক্রে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরে আসতে আসতে ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণতম বিন্দুতে (মকর ক্রান্তি বিন্দু) উপনীত হয়। সূর্যের এই ছয় মাস ব্যাপী দক্ষিণ অভিমুখী অভিযাত্রাকে বলা হয়ে থাকে দক্ষিনায়ন, অন্য দিকে ২২শে ডিসেম্বরের পর থেকে সূর্য পুনরায় রাশি চক্রে ক্রমশঃ উত্তর দিকে সরতে সরতে জুন মাসে উত্তরতম বিন্দুতে উপনীত হয় (কর্কট ক্রান্তি বিন্দূ) - সূর্যের এই ছয়মাস ব্যাপী উত্তরাভিযানকে বলা হয় উত্তরায়ন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সূর্য রাশি চক্রে চারটি কার্ডিনাল বিন্দুতে – মহা বিষুব সংক্রান্তি (vernal equinox), জলবিষুব সংক্রান্তি (autumnal equinox), উত্তর অয়নান্ত (summer solstice)বিন্দু এবং দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দুতে (winter solstice) উপনীত হয় যথাক্রমে ২২শে মার্চ, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২১শে জুন ও ২২শে ডিসেম্বর তারিখে। কিন্তু বাংলা পঞ্জিকাকারগণ যে তারিখগুলিকে এই দিবসগুলিকে চিহ্নিত করে তার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত উক্ত তারিখগুলোর একদম মিল নেই। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আমার হাতের কাছে লোকনাথের ১৪১৪ সালের পঞ্জিকাটি রয়েছে। ওদের মতে এই সনে মহাবিষুব সংক্রান্তি হবে ৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল), ৮ই চৈত্রের (২২শে মার্চ) পরিবর্তে, – ২২ দিনের ব্যবধান। এর কারণ পঞ্জিকাকারগণ তাদের গণনায় নক্ষত্র বছর (sidereal year) ব্যবহার করে থাকে (যেখানে অয়ন বিন্দুদ্বয়ের গতিকে হিসাবে আনা হয় না) ক্রান্তি বৎসরের (tropical year) পরিবর্তে। বর্তমান হিসেব মতে γ বিন্দুটি (first point of Aries,γ) কোন স্থির নক্ষত্রের সাপেক্ষে সূর্যের গতির উল্টো দিকে সরে আসছে, ফলে γ বিন্দুটির সাপেক্ষে সূর্যের আপাত অবস্থানের মধ্যে ও পঞ্জিকার হিসাবের সূর্যের অবস্থানের মধ্যে দূরত্ব

বেড়ে চলেছে। যদি ধরা হয় যে ৫৭০ অব্দে সিদ্ধান্তিক গণনা চালু কালে মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়তো ৩০ বা ৩১শে চৈত্র হত। অয়ন বিন্দুর এই পশ্চাৎগামিতার ফলে এখন প্রকৃত মহাবিষুব সংক্রান্তি ঘটে থাকে ৭ই বা ৮ই চৈত্র (২২ শে মার্চ)। হিসাব করে দেখা গেছে যে, পঞ্জিকার এই গণনা পদ্ধতি অব্যাহত থাকলে, আগামী ২০০০ বছরের মধ্যে আমরা যথাযথ ঋতু থেকে একমাস এগিয়ে যাব, অর্থাৎ যে সব অনূষ্ঠাণ হওয়ার কথা বসন্তকালে তা পড়বে মধ্য শীতে। সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তিক পণ্ডিত পঞ্জিকাবিশারদগণ কী আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানকে অস্বীকার করেই যাবেন, আর তাদের অনুসারী সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়াতেই থাকবেন। আমাদের কি আর একজন প্রগতিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক বিদ্যাসাগরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

(ছবিগুলো ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)